দৈনিক
ইনকিলাব

08 DEC 2005

বাংলাদেশের শিক্ষা ব্যবস্থার উন্নয়ন পরিকল্পনা ও গবেষণা

প্রফেসর ড. মোঃ শাহ-ই-আলম

স্বাধীনতার পরে তিন দশকেরও বেশী সময় পার হয়ে গেলেও অদ্যাবধি দেশের প্রাথমিক পর্যায় থেকে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায় পর্যন্ত এই নব্য স্বাধীন দেশের আকাঙ্ক্ষা ও চাহিদা অনুযায়ী শিক্ষা ব্যবস্থার একটি পূর্ণাঙ্গ রূপরেখার বাস্তবায়ন আমরা দেখতে পাইনি। প্রতিনিয়ত একক ব্যক্তির চিন্তাধারা, কমিশন বা কমিটির নামে কোন কোটারীভুক্ত দল বা গোষ্ঠীর চিন্তার প্রতিফলন আমরা শিক্ষা ক্ষেত্রে দেখতে পাই। সরকার পরিবর্তনের সাথে সাথে বিভিন্ন সময় বিভিন্ন শিক্ষা কমিশন বা কমিটির নামে শিক্ষা ব্যবস্থা উন্নয়নের নামাবলী গায়ে চড়িয়ে দর্শায় দৃষ্টিভঙ্গির প্রতিচ্ছবি আবৃত সুপারিশমালা জানার এবং দেখার সুযোগ দেশবাসীর হয়ে থাকে। নতুন সরকার ক্ষমতায় এসেই শিক্ষা ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তনের ঘোষণা দিয়ে যুগোপযোগী করার কথা বলে একটি শিক্ষা কমিশন বা কমিটি গঠন করে, সেই সরকারেরই রাজনৈতিক চিন্তাধারায় সম্পৃক্ত, তাদের ভাষায় জাতীয় বরেণ্য শিক্ষাবিদ/ব্যক্তিদের নিয়ে। এভাবে আমরা স্বাধীনতার পর কুদরত-ই-খুদা শিক্ষা কমিশন থেকে শুরু করে বর্তমান মনিরুজ্জামান শিক্ষা কমিশনসহ বেশ কয়েকটি শিক্ষা কমিশন/কমিটি পেয়েছি। প্রায় সকল শিক্ষা কমিশনই, তাদের ভাষায়, দেশের শিক্ষা ব্যবস্থার অভূতপূর্ব উন্নয়ন ও দেশের কর্মক্ষম লাগসই জনবল তৈরীর লক্ষ্যে সুপারিশমালা প্রণয়ন করেছে। কিন্তু কোন সরকারই, এমনকি তাদের নিজেদের তৈরী কমিশনের সুপারিশও যথাযথভাবে বাস্তবায়ন করেনি বা করতে সক্ষম হয়নি। যার ফলে অদ্যাবধি আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থার একটি সর্বাঙ্গীণ সুন্দর বাস্তবমুখী ব্যবস্থাপনা গড়ে ওঠেনি। ফলশ্রুতিতে শিক্ষা ব্যবস্থা উন্নয়নের নামে নানা পরস্পর বিরোধী চিন্তা-ভাবনা, কল্পনা ও গবেষণা আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থাকে দিনকে দিন আরো জটিল, দুর্বোধ্য ও দুর্গম করে তুলছে। ভবিষ্যতের নাগরিক বলে কথিত আমাদের আগামী প্রজন্ম প্রতিনিয়ত এ ধরনের নতুন নতুন গবেষণা ও চিন্তাধারার গিনিপিগ হয়ে তাদের এবং জাতির ভবিষ্যত এক অনিশ্চিত অন্ধকারের দিকে অগ্রসর হচ্ছে।

দেশের প্রাথমিক, মাধ্যমিক, উচ্চ মাধ্যমিক ও বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে প্রতিনিয়ত শিক্ষা ব্যবস্থা ও পাঠ্যক্রমের যেভাবে পুনর্বিন্যাস হচ্ছে এবং উন্নয়নের নামে নতুন নতুন চিন্তা ও ধ্যান-ধারণা সন্নিবেশিত হচ্ছে তাতে সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে শিক্ষার্থীরা। দেশে বর্তমানে প্রচলিত বিভিন্ন ধরনের শিক্ষা ব্যবস্থার প্রসঙ্গ না এনেও বলা যায় যে, সরকার কর্তৃক পরিচালিত/নিয়ন্ত্রিত শিক্ষা ব্যবস্থাতেও বছর বছর পরিবর্তনকৃত ব্যবস্থাপনাতে শিক্ষার্থী তথা অভিভাবকরা শংকিত ও আতঙ্কিত। প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ করা যায় যে, এই কিছুদিন পূর্ব পর্যন্ত আমাদের মাধ্যমিক পর্যায়ে প্রতি বিষয়ে ১০০ নম্বরের পরীক্ষা দিয়ে ছাত্র-ছাত্রীদের প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় বিভাগে উত্তীর্ণ করা হতো। মাঝে প্রবর্তন করা হলো প্রশ্ন ব্যাংক বলে কথিত এক পদ্ধতি। তার কুফলের মাত্রা দ্রুত অনুভূত হওয়ায় তড়িঘড়ি করে তা পরিবর্তন করা হলো। প্রবর্তিত হলো বিশ্বমানের গ্রেডিং পদ্ধতি। বহুদিনের প্রচলিত ইংরেজী পরীক্ষার পদ্ধতিতে আনা হলো হাস্যকর পরিবর্তন। ব্যাকরণ বিহীন পরীক্ষা পদ্ধতি ইংরেজীর মত একটি বিদেশী ভাষা শেখার সহায়ক কতটুকু হবে তা জানার জন্য আমাদের অতি অল্প কিছুদিন অপেক্ষা করতে হবে বলে আমি মনে করি। ৮ম শ্রেণীর পরে অর্থাৎ ৯ম শ্রেণী থেকে যুগ যুগ ধরে প্রচলিত পাটি গণিত তুলে দিয়ে কী অংক শিক্ষাকে অগ্রগামী করা হলো না পশ্চাতে ফেলে দেয়া হলো? তা দেখার জন্যও খুব বেশী দিন অপেক্ষা করতে হবে বলে মনে হয় না। এক সময়ে MCQ পদ্ধতি, এক সময়ে রচনা মূলক (Subjective), এক সময় নৈর্ব্যক্তিক (Objective), আবার কোন কোন সময়ে এগুলোর সমন্বয়ে পরীক্ষা পদ্ধতির সাথে আমাদের পরিচয় ঘটেছে। কিন্তু কোন পদ্ধতিটি আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থাকে সুন্দর ও সঠিকভাবে কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে পৌঁছাতে সাহায্য করবে তা আমরা আজও নির্ধারণ করে উঠতে পারিনি। সম্প্রতি সংবাদপত্র ও টেলিভিশনের মাধ্যমে শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী মহোদয়ের কাছ থেকে আমরা আর এক নতুন পদ্ধতির কথা জানতে পেরেছি যা নাকি ২০০৫ সাল থেকে চালু হতে যাচ্ছে। শিক্ষার্থীরা নতুন এ ব্যবস্থার সুফল/কুফল এখনও চিন্তা করতে না পারলেও আমরা অভিভাবকরা সার্বিক কুফল অগ্রিম চিন্তা করে এখনই আমাদের সন্তানের ভবিষ্যত নিয়ে আতঙ্কিত ও দুঃশ্চিন্তাগ্রস্ত। নতুন ৭এ পদ্ধতির ভবিষ্যত নিয়ে আতঙ্কই আমাকে এ লেখা লিখতে বাধ্য করেছে। নতুন এ পদ্ধতিতে শতকরা ৩০ নম্বর স্ব স্ব স্কুলের শিক্ষকের হাতে থাকবে এবং বাকি ৭০ নম্বর যথারীতি বর্তমানের মত পাবলিক পরীক্ষার মাধ্যমে থাকবে। এ পদ্ধতির পক্ষে মাননীয় প্রতিমন্ত্রী যেসব যুক্তি দাঁড় করিয়ে বক্তব্য দিয়েছেন তা যেমনি হাস্যকর তেমনি বাস্তবতা বিবর্জিত। আমাদের দেশের পাবলিক পরীক্ষার সময়ে যেখানে ছাত্র-ছাত্রীদের সাথে শত শত শিক্ষক পরীক্ষার হলে নকলে সহযোগিতার অপরাধে বহিষ্কৃত হয়, সেখানে সেই শিক্ষকের হাতে ৩০% নম্বর দেয়ার ক্ষমতা দেয়া হলে তারা কিভাবে সে নম্বর প্রয়োগ করবেন বা প্রয়োগ করতে বাধ্য হবেন তা সহজেই অনুমেয়। প্রতি বছর অসংখ্য স্কুল থেকে কোন ছাত্র-ছাত্রী পাস করতে না পারার কারণে মন্ত্রী বাহাদুরেরাই হুমকি দিয়ে থাকেন সেই সব স্কুলের সরকারী অনুদান বন্ধ করে দেয়ার। নতুন এ ব্যবস্থায় সেই সব স্কুলগুলো হুমকিমুক্ত থাকতে মন্ত্রী বাহাদুরই ব্যবস্থা করে দিচ্ছেন ৩০% নম্বর দিয়ে সকলকে পাস করার সুযোগ নিশ্চিত করে অনুদান ঝুঁকিমুক্ত রাখতে। উপরন্তু গ্রাম, উপশহর এমনকি শহরের স্কুলগুলোতেও গ্রাম সরকার, স্থানীয় মাতব্বর, মোড়ল, মেম্বার, কমিশনার, চেয়ারম্যান, সন্ত্রাসী তথা রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক শক্তিধরদের ছেলে মেয়েদের ৩০ থেকে ১ নম্বর কম দিলেও কোন শিক্ষক নিরাপদে শিক্ষকতা করতে পারবেন তা বর্তমান পরিস্থিতিতে কোনভাবেই বিশ্বাসযোগ্য নয়। এইচএসসি পরীক্ষায় অংশ গ্রহণের জন্য স্কুল টেষ্ট পরীক্ষায় সকল বিষয় পাস করা ছাত্র-ছাত্রীদের সুযোগদানের সরকারী নীতিমালা কয়টি স্কুল শিক্ষকরা পালন করেন বা করতে পারছেন? সকল বিষয়ে ফেল করা ছাত্র-ছাত্রীদেরও কখনও কখনও টাকার বিনিময়ে অথবা ভয়ে পাস দেখিয়ে পরীক্ষা দেয়ার সুযোগ দিতে বাধ্য হচ্ছেন স্কুল কর্তৃপক্ষ। প্রতিমন্ত্রী মহোদয় নতুন ধারার এ পদ্ধতির মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের ক্লাসে ফিরিয়ে আনার এবং শিক্ষকদের শিক্ষাদানের প্রতি একাগ্রতা ও একনিষ্ঠতার নিশ্চয়তার কথা বলেছেন। কিন্তু বাস্তবে কি তাই হবে? বর্তমানে বেশীরভাগ শিক্ষার্থীই ক্লাস তথা স্কুলে যাওয়ার ব্যাপারে খুবই অনীহা প্রকাশ করে থাকে। পক্ষান্তরে, তারা তাদেরই স্কুলের শিক্ষক বা অন্য শিক্ষকদের বাড়ীতে বাড়ীতে গিয়ে প্রাইভেট পড়ে শিক্ষা গ্রহণে ব্রতী হচ্ছে। স্কুলের শিক্ষকদের কাছে প্রাইভেট না পড়লে ভাল নম্বর পাওয়া যাবে না, ক্লাসে ১ম, ২য় হওয়া যাবে না এটাইতো এখন চরম বাস্তবতা। বাংলা, ইংরেজী, অংক ও বিজ্ঞানের বিভিন্ন বিষয়ে প্রাইভেট না পড়লে খুব কম শিক্ষার্থীই তার কাঙ্ক্ষিত ফলাফল করতে পারছে। প্রাইভেট পড়ে কতটুকু শিখল, বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই তার চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হলো কিছু টাকার বিনিময়ে পরীক্ষায় তথাকথিত ভাল ফলাফল নিশ্চিত করা। এইসব শিক্ষকের (খুব অল্প সংখ্যক বাদে) হাতে ৩০% নম্বর দেয়ার ক্ষমতা কতটা নিরাপদ ও নিরপেক্ষ হবে তা কল্পনা করতেই গা শিউরে উঠে। এই ৩০% নম্বর পাওয়ার জন্য কোমলমতি শিক্ষার্থীদের শুধু বাংলা, ইংরেজী ও অংক প্রাইভেট পড়লেই চলবে না, তখন সকল বিষয়ে প্রাইভেট পড়তে হবে সকল বিষয়ের শিক্ষকের কাছ থেকে ৩০ নম্বরের নিশ্চিয়তার বিধানের জন্য। শিক্ষার্থীদের ক্লাস রুমে ফিরিয়ে আনার পরিবর্তে সার্বক্ষণিকভাবে তাদের ঠেলে দেয়া হয়ে কোচিং সেন্টার এবং শিক্ষকদের নিজস্ব পাঠশালায়। প্রাথমিক থেকে মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলো অস্তিত্ব থাকবে শুধুমাত্র ছাত্র-ছাত্রীদের নাম এনরল করে বৈধতা দেয়ার জন্য। বৈষম্য শুরু হবে সরকারী, বেসরকারী, এমপিওভুক্ত, এমপিও বহির্ভূত স্কুলগুলোর মধ্যে।

উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়েও Optional Subject (4th subject) যোগ হবে কি হবে না, কত নম্বর যোগ হবে, কিভাবে যোগ হবে এ নিয়ে টানাটানি বহু দিনের। এতে শিক্ষার্থীরা যেমনি আতঙ্কে থাকে তেমনি মেধা নির্বাচনেও যথেষ্ট বিভ্রান্তির সুযোগ থেকে যায়। জীব বিজ্ঞান ও অংকের অগ্রগণ্যতা নিয়ে বিভেদ তো আছেই।

বাংলাদেশের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে বিভিন্ন ধরনের পেশাভিত্তিক ও বিষয়ভিত্তিক উচ্চ শিক্ষার ব্যবস্থাপনার অবস্থা আরো করুণ। একই বিষয়ে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে দেয়া ডিগ্রির কোর্স কারিকুলাম, সিলেবাস ও কোর্সের সময়ের দৈর্ঘ্যে অসমতা দারুণভাবে বিভ্রান্তিকর। কোথাও সনাতনী বাৎসরিক সিস্টেম, কোথাও আবার কোর্স সিস্টেম বা সেমিস্টার সিস্টেম। সেমিস্টার সিস্টেমের মধ্যে কোথাও বাই-সেমিস্টার আবার কোথাও বছরে তিনটি নিয়মিত সেমিস্টার পদ্ধতিতে ডিগ্রি দেয়া হচ্ছে। বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে একই বিষয়ের উপরে ডিগ্রির জন্য বিভিন্ন কোর্স ক্রেডিট চালু আছে। এই বিভ্রান্তিকর পরিস্থিতি চরমে পৌঁছে দিয়েছে ব্যাঙের ছাতার মত গজানো প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়গুলো। Arts-এর ছাত্র হয়েও ইঞ্জিনিয়ারিং বা আর্কিটেকচারের মত বিষয়ে ভর্তি হওয়ার সুযোগ পাওয়া যায় এ সকল ব্যক্তিগত বা প্রাইভেট প্রতিষ্ঠানগুলোর কোন কোনটাতে। মাধ্যমিক এবং উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার রেজাল্টও খুব একটা বিবেচনায় নেয়ার প্রয়োজন তারা অনেক ক্ষেত্রে মনে করেন না। তাদের বিবেচ্য শুধুই টাকা। টাকা হলে যে কেউই যে কোন বিষয়ে পড়তে পারে এবং গতানুগতিক একটি নির্দিষ্ট সময় অতিক্রমনান্তে ডিগ্রি নিয়ে নিতে পারে। দেশে বর্তমানে ৫০টিরও বেশী প্রাইভেট বা ব্যক্তিগত বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক প্রদত্ত ডিগ্রি, শিক্ষাক্রম ও তার মান নিয়ে গবেষণা করার জন্য বর্তমান কুরিকর্মা সরকার আর একটি নতুন মন্ত্রণালয় খুলে আরো নতুন মন্ত্রী, প্রতিমন্ত্রী এবং উপমন্ত্রী নিয়োগের সুযোগ গ্রহণ করতে পারে।

১৭টি পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের অবস্থাও যে সন্তোষজনক এ দাবি করা যাবে বলে মনে হয় না। স্বায়ত্বশাসনের সুযোগে শিক্ষা কার্যক্রম নিয়ে ছিনিমিনি খেলা এ সকল বিশ্ববিদ্যালয়েরও নিয়মিত ঘটনা হয়ে দাঁড়িয়েছে। Annual system থেকে Semester System, semester system থেকে আবার Annual system, ৩ বছরের কোর্স ৪ বছর করা, আবার ৪ থেকে ৩-এ নামিয়ে আনা, ডিগ্রীর সাথে একবার অনার্স লেখা আবার ছাত্রদের দাবীর মুখে অনার্স প্রবর্তন তুলে দিয়ে পুনঃপ্রবর্তন করা, স্নাতকোত্তর পর্যায়ে বিজ্ঞানের প্রতিটি বিষয়ের জন্য থিসিস বাধ্যতামূলক করা আবার থিসিস-নন থিসিস গ্রুপ করা, থিসিসের জন্য একেক সময় এক এক ধরনের নম্বর প্রবর্তন করা, আবার কোন কোন সময়ে থিসিসে নম্বর তুলে দেয়া, মৌখিক পরীক্ষা তুলে দেয়া আবার নম্বরসহ পুনঃপ্রবর্তন করা, কোর্সে প্রাকটিক্যাল অন্তর্ভুক্ত করা আবার তা তুলে দেয়া, এ সবই অহরহ ঘটছে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে শুধুই ব্যক্তি বিশেষের ক্ষণিকের স্বার্থে এবং প্রায়শঃই ছাত্রদের অযৌক্তিক নিয়ম বহির্ভূত চাপের পরিপ্রেক্ষিতে। নিয়মকে অনিয়ম এবং অনিয়মকে নিয়মে পরিণত করার জন্য প্রয়োজন শুধু একটি একাডেমিক কাউন্সিলের সভার। শতকরা ৭৫টি ক্লাসে হাজিরা, পর পর ৩/৪ বার ফেল করলে পুনঃ ভর্তির সুযোগ রহিত করাসহ নিয়মিত যে সকল নিয়ম কানুনের মধ্যে বিশ্ববিদ্যালয় চলার কথা তা শুধুই নিরীহ, অরাজনৈতিক ছাত্র-ছাত্রীদের বেলায় এককভাবে প্রযোজ্য। রাজনৈতিক মদদপুষ্ট, বিশেষ করে সরকারী দলের সমর্থক হলে তো অনিয়মকে নিয়মে তৈরী করা স্বায়ত্বশাসিত এ সকল প্রতিষ্ঠানের প্রশাসনিক দায়িত্ব ও কর্তব্য বলে প্রচলিত হয়ে আসছে।

মাধ্যমিক, উচ্চ মাধ্যমিক ও বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে অযাচিত অপ্রয়োজনীয় পরিবর্তনগুলো আমাদের আরো বেশী বিভ্রান্ত করে এবং আমাদের শিক্ষা কার্যক্রমকে ব্যাহত করে। এ থেকে উত্তরণের পথ দেখাতে পারে শুধুমাত্র সচেতন শিক্ষকরাই। মন্ত্রী, প্রতিমন্ত্রী, উপমন্ত্রী বা সচিবদের নির্দেশে মুহূর্তের মধ্যেই শিক্ষা ব্যবস্থার কাঠামো পরিবর্তনের প্রেসক্রিপশন ঠেকাতে পারে, জাগ্রত সুশিক্ষিত শিক্ষক সমাজ। একজন শিক্ষক হিসেবে একজন অভিভাবক হিসেবে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সাথে সম্পৃক্ত সকল মহলের কাছে আবেদন জানাই, মাধ্যমিক পর্যায়ে স্কুল শিক্ষকদের হাতে ৩০% নম্বর দেয়ার আত্মঘাতী সিদ্ধান্ত নেয়া থেকে বিরত থাকার জন্য। সুষ্ঠু, সুন্দর গঠনমূলক যুগোপযোগী মেধাবী সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে তা বাস্তবায়নে এগিয়ে আসুন এবং আমাদের সন্তানদের আগামী প্রজন্মের দক্ষ নাগরিক হিসেবে গড়ে তুলতে সাহায্য করুন। এতে আমরা উপকৃত হব- জাতি উপকৃত হবে।